ভূমিকা

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে, যখন মানুষ কথা বলতে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করল, তখন থেকেই গল্প বলার শুরু। মানুষ গল্প শুনতে এবং গল্প সৃষ্টি করতে ভালোবাসে। সভ্যতার বিচিত্র অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পও নানাভাবে ভাষায় রসে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মানুষের গল্প শোনার এই চিরন্তন বৃত্তিটি শিল্পদৃষ্টির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নবরূপ লাভ করে চলেছে।

প্রতিটি দেশের প্রাচীন সাহিত্যেই গল্পের নানা উপাদান কোন না কোনভাবে বিরাজিত। লেখ্য পদ্ধতির সূচনা হয়নি বলে কথাকোবিদরা এবং দিদিমা-ঠাকুমারা মুখে মুখে গল্প বলে সেগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করে রেখেছেন। সর্বকালে মুখে মুখে অথবা লেখ্যরূপে কথারস পরিবেশনের নিপুণতাই মানুষের গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করেছে।

প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রহস্যময়ী। আদিম যুগের মানুষের কাছে প্রকৃতির এই রহস্যময় সৌন্দর্য্য ছিল অপার মুগ্ধতার বিষয়। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋক্‌বেদেও তাই বিশ্বপ্রকৃতিকে কেন্দ্র করে মানুষের বিস্ময়াকুলতাই স্থান পেয়েছে। ঋক্‌বেদে কয়েকটি গল্প আভাসিত হয়ে উঠেছে। এখানে রয়েছে উর্বশী ও পুরূরবার কাহিনি।

বৈদিক সাহিত্যেও অনেক গল্পের কাঠামোর নিদর্শন মেলে। মনু ও যমের পিতা বিবস্বানকে নিয়ে গল্প রয়েছে। উপনিষদেও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত ও উচ্চ ভাবাদর্শ বিশিষ্ট অনেক গল্প রয়েছে।

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যেও যে পুরাণকাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেখানে তাৎপর্যমণ্ডিত অনেক প্রথম শ্রেণির গল্প রয়েছে। এই কাহিনিগুলোতে মানবজীবনের বিবিধ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জুপিটার-লেডা, নার্সিসাস-ইকো, ভেনাস-অ্যাডোনিস প্রভৃতি চরিত্রদের মানবিক ধর্মগুলো কবিরা অঙ্কিত করেছেন।

লোকসাহিত্যের মধ্যেও কাহিনি বর্ণনার একটি প্রয়াস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লোককথা (Folk tale), রূপকথা (Fairy tale), পশুপাখি সংক্রান্ত নীতিগল্প (Fable), লোকগীতিকা (Ballad), লৌকিক পুরাণ (Myth) ও জনশ্রুতিমূলক আখ্যায়িকা (Tale) — প্রভৃতি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার প্রকাশে আমরা নানা ধরনের কাহিনির উল্লেখ পাই।

রূপকথার রূপকের আবরণে বাস্তবজীবনবোধকে পাওয়া যায়। যেমন — শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালাতে

বাস্তবজীবনের প্রাত্যহিক সত্য প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপীয় রূপকথা সিন্ডারেলা (Cinderella), স্নো হোয়াইট (Snow-white) প্রভৃতি একইভাবে পাঠকমহলে প্রভাব বিস্তার করেছে। ছোটগল্পের উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে উদার মুক্ত মনের পরিচয়ও রূপকথাতে পাওয়া যায় তার দিগন্ত বিস্তৃত কল্পজগতের মাধ্যমে।

রূপকথার চেয়েও বাস্তবতার কঠোর সত্যকে নিয়ে প্রকাশিত হয় গীতিকাগুলো যেখানে গল্পও রয়েছে। যেমন 'মৈমনসিংহ গীতিকা' তে কৃষক কবিদের রচিত আখ্যায়িকা রয়েছে। এই গীতিকার তীব্র সংহত একমুখী পরিণতি ও ঘটনাস্রোতের দ্রুততার মধ্যে ছোটগল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য লুকায়িত রয়েছে বলে মনে হয়।

নীতিগল্প হিসেবে যে গল্পগুলো লিখিত হয়েছে তাতে পশুপাখীর স্থানই বেশি। যেমন বিষ্ণু শর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'ঈশপের ফেবলস্'। কাহিনিগুলোতে জীবন ঘনিষ্ঠতার প্রভাব রয়েছে বিস্তর।

প্রাচীন ভারতীয় কথা সাহিত্যের উৎস হিসেবে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' গ্রন্থটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই 'বৃহৎকথা' কে অবলম্বন করেই ক্ষেমেন্দ্র 'বৃহৎকথামঞ্জরী' রচনা করেছেন এবং সোমদেব রচনা করেন 'কথাসরিৎসাগর'। সংস্কৃত কথাসাহিত্যের আরো নিদর্শন মেলে দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' ও বাণভট্টের 'কাদম্বরী' তে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গল্পের গ্রন্থাগার যেন 'কথাসরিৎসাগর'। পারস্য ভাষায় রচিত 'আরব্য উপন্যাস' এশিয়া এবং ইউরোপকে এক গদ্যরূপী মহাকাব্যের স্বাদ আস্বাদন করায়।

ইতালিতে নবজাগরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য জগতে এল বিরাট পরিবর্তন। পূর্বোক্ত রচনারাজির চাইতে ছোটগল্পের অনেক গুণাবলী সমৃদ্ধ রচনা প্রকাশিত হল গিওভানি বোকাচ্চিওর (১৩১৩-১৩৭৫) 'ডেকামেরণ'। বোকাচ্চিওকেই অনেকে আধুনিক ছোটগল্পের পথিকৃৎ বলে অভিহিত করে থাকেন। কারণ 'ডেকামেরণ' এর গল্প সমষ্টির অধিকাংশেরই সংক্ষিপ্ত পরিসর, গতির দ্রুততা এবং আকস্মিক পরিসমাপ্তি যেন ছোটগল্পের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। বোকাচ্চিওর পরে কথাসাহিত্যে যাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে তিনি হলেন জিওফ্রে চসার (১৩৪০ ? - ১৪০০ খ্রীঃ)। সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে অসমাপ্ত 'ক্যান্টারবেরি টেল্স', 'ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা' (১৩৮৫ খ্রীঃ) ও 'দি লিজেন্ড অব্ গুড্ উইমেন' (১৩৮৫ খ্রীঃ)।

উনিশ শতকে সমগ্র বিশ্বে ছোটগল্প রচনার জোয়ার আসে। মহাকালের ইতিহাসে যখন মহাসঙ্কট উপস্থিত হয় তখন সেখানে যে সামাজিক ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয় তাই ভাব ও বোধের জগতকে আলোড়িত করে তোলে। আর সাহিত্যিকরা তখন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্য প্রবল আর্তির সঙ্গে অভিমানাহত হয়ে জন্ম দেন ছোটগল্পের। ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার জারের অপশাসন থেকে এই

ছোটগল্পের ঝড়ের সূত্রপাত ঘটে।

ফরাসী সাহিত্যে এলেন 'স্তাঁদাল' (১৭৮৬-১৮৪২), তাঁর বিখ্যাত গল্প 'The Philtre' ও 'The Jew'। এরপরে সর্বকালের সেরা কথাসাহিত্যিক 'ব্যালজাক্' (১৭৯৯-১৮০০) কে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত 'A passion in the Desent' ও 'La Grande Breleche' হল বিখ্যাত গল্প। ছোটগল্পে টেকনিকের জন্ম দিলেন 'প্রস্পার মেরিমে' (১৮০৩-৭০)। 'Mateo Falcon' ও 'The Blue Room' গল্পগুলো উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। এরপরে 'এমিল জোলা' (১৮৪০-১৯০২) তাঁর রচনায় ন্যাচারিলিজমকে নিয়ে এলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের মধ্যে একজন হলেন 'গী-দ্য-মোপাসাঁ'। তিনি কুড়ি বছর বয়সে লেখেন বিখ্যাত গল্প 'Buil de Suif' (চর্বির গোলা), এছাড়াও 'The Necklace' তাঁর অন্যতম গল্প। 'আলফঁস দোদে' (১৮৪৮-১৮৯৭) 'The Two Inns' গল্পের মাধ্যমে সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ছোটগল্পের সমৃদ্ধির জগতে এরপরেই স্থান হল রাশিয়ান সাহিত্যের। সাহিত্যে আধুনিকতাকে রাশিয়াতে নিয়ে এলেন আলেকজাণ্ডার পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭)। 'Queen of Spades', 'The Shot', 'Snow storm' গল্পগুলো বহুখ্যাত। আধুনিকতায় বস্তুধর্মিতা ও তীক্ষ্মতা নিয়ে পুশ্‌কিনের পরে ছোটগল্পে এলেন নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-১৯৫২)। 'ওভারকোট' তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প। এরপর তুর্গেনিভ (১৮১৮-১৮৮৩) গদ্যরীতিকে সুষমামণ্ডিত করে তোলেন। সত্য ও সুন্দরের অনুভূতি নিয়ে সাহিত্য রচনা করে বিশ্ব সাহিত্যে অম্লান হয়ে আছেন কাউন্ট লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০)। মোঁপাসার সমগোত্রীয় রুশসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পকার হলেন আন্তন চেকভ (১৮৬০-১৯০৪)। 'Ward No. 6', 'The Black Monk', 'The Grass Hopper' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠগল্প। গল্পের প্রথম খণ্ডের সংস্করণ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাতির শীর্ষে চলে যান অপর এক লেখক ম্যাক্সিল গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ইংরেজি হলেও ছোটগল্পের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এখানে রয়েছেন রবার্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০-১৮৯৪), যাকে বলা যায় ছোটগল্পের স্রষ্টা। 'ডক্টর জেকিল ও সিস্টার হাইড' তাঁর বিখ্যাত রচনা। অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০) 'দি পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে' নামে গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়াও রয়েছে 'চার্লস ডিকেন্স', 'মাইকেল কলিন্স', 'টমাস হার্ডি', 'কোনান ডয়েল', 'সমার সেট মম', 'ই. এম. ফস্টার', ও ডি. এইচ. লরেন্স' এর নাম উল্লেখযোগ্য

ওয়াশিংটন আরভিঙ্ (১৭৮৩-১৮৫৯) এর সময় থেকেই আমেরিকান সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা দৃষ্টিগোচর হয়। এই ধারাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-৪৯)। 'The Black cat', 'The Pit and the Pendulum' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত রচনা। 'পো' র সমকালীন

লেখক ন্যাথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪ - ৬৪) ' দি স্কারলেট লেটার' লিখে খ্যাতির শীর্ষে উঠে যান। 'Twice-Told-Tales' তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন হিসেবে পরিগণিত। মার্ক টোয়েন (১৮৩৫-১৯১০), হেনরি জেমস (১৮৪৩ - ১৯১৬), ফ্রান্সিস ব্রেট হার্ট প্রমুখরা আমেরিকার সাহিত্যের ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

ছোটগল্পে বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের ঠিক পরেই অর্থাৎ কনিষ্ঠ লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পের রূপকার। কিন্তু তাঁরও আগে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫ -১৯৩২) এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ - ১৯১৯) কিছু গল্প রচনা করেন। ছোটগল্পগুলো আত্মপ্রকাশ করত প্রথমে কোন পত্রিকায়; 'ভারতী' র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা ভারতী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

বাংলা কথা সাহিত্যের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৯-১৮৯৪) হাতে। তাঁর সাহিত্যের মতো 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকাও এক অনন্য সৃষ্টি। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল 'ইন্দিরা' (১৮৭২) ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৩) উপন্যাস। সেখানে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দিক থেকে ছোটগল্পের মৃদু পদধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। এরপরেই ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প 'মধুমতী' (১৮৭৩)।

বাংলা সাহিত্যে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের 'ভারতী' সংখ্যায় 'ভিখারিণী' গল্পের মাধ্যমে বীরের মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সাপ্তাহিক হিতবাদী', 'সাধনা' 'সবুজ পত্র' তাঁর রচনার দ্বারা পরিপুষ্ট হতে শুরু করল এবং রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই ছোটগল্পের জগতে স্বমহিমায় রাজকীয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে উঠতে লাগলেন।

'রাজপথের কথা' (১২৯১) ছিল গল্পহীন কথা আর 'ঘাটের কথা' (১২৯১) তে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সূচনা ঘটান। এই সূচনা-বিন্দু পল্লবিত হয়ে ওঠে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রথম পর্যায়ের ছয়খানি গল্প প্রকাশের মাধ্যমে। যেমন — 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পের মাধ্যমে। প্রতিটি গল্পই ১২৯৮ সালে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় 'সাধনা' পত্রিকাতে। গুরুগম্ভীর বিষয় নির্বাচনে 'হিতবাদী'র সম্পাদক 'সন্তুষ্ট নয়, তাই গ্রাম ছেড়ে নগর সভ্যতায় প্রবেশ করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখলেন 'দালিয়া' (১২৯৮), 'একরাত্রি' (১২৯৯), 'মধ্যবর্তিনী' (১৩০০), 'মানভঞ্জন' (১৩০২), 'দুরাশা' (১৩০৫), 'দৃষ্টিদান' (১৩০৫), 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) ও 'মাল্যদান' (১৩০৯)। প্রকৃতি ও মানুষ একীভূত হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হল 'সুভা' (১২৯৯), 'সমাপ্তি' (১৩০০) ও 'অতিথি' (১৩০২) র মতো গল্প।

সাময়িক পত্রিকাগুলোই সাধারণতঃ ছিল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বাহন। পত্রিকায় প্রকাশনার

ওপর ভিত্তি করেই তাঁর ছোটগল্পগুলোকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। (১) **হিতবাদী পর্ব** (ছয়টি গল্প) ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, (২) **সাধনা** (১২৯৮-১৩০২) ও **ভারতী** (১৩০৫-১৩১৮) **পর্ব**। 'সাধনা'য় পাঁচ বছরে ছত্রিশটি গল্প প্রকাশিত হয় এবং 'ভারতী'তে প্রায় পনেরোটি গল্প প্রকাশিত হয়।(৩) **সবুজপত্র** (১৩২১-১৩২৪) **পর্ব**। এই পত্রিকায় দশটি গল্প প্রকাশিত হয়। (৪) **তিনসঙ্গী পর্ব** (তিনটি গল্প)। আনন্দবাজার শারদীয়া সংখ্যায় ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হয় 'রবিবার'। 'শনিবারের চিঠি'তে ১৩৪৬ সালে 'শেষ কথা' এবং ১৩৪৭ সালের আনন্দবাজার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নানাদিকগুলি ধরা পড়ে। যেমন — প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ। ব্যক্তি ও সমাজ একত্রিত হয়ে রচিত হয় 'দেনাপাওনা' (১২৯৮), 'সদর ও অন্দর' (১৩০৭), 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' (১৩০৮), 'হালদার গোষ্ঠী' (১৩২১)র মত গল্প। মানুষে মানুষে সম্পর্কের সূত্র ধরে আসে — 'দান প্রতিদান' (১২৯৯), 'দিদি' (১৩০১), 'মাস্টারমশাই' (১৩১৪), 'রাসমণির ছেলে' (১৩১৮), 'পণরক্ষা' (১৩১৮), 'শেষের রাত্রি' (১৩২১) র মতো গল্প। 'কঙ্কাল' (১২৯৮), 'নিশীথে' (১৩০১), 'মণিহারা' (১৩০৫) প্রভৃতি গল্পে অলৌকিকতার হাতছানি পাওয়া যায়।

রূপোপজীবনীদের কথা রবীন্দ্রনাথ 'বিচারক' (১৩০১) গল্পে প্রথম তুলে ধরেন। বিশ্বমানবতার প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১) গল্পে রাজনীতি ও স্বদেশপ্রীতিকে তুলে ধরেছেন।

পরিণত বয়সের প্রগাঢ় প্রাজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ ব্যবহার করেছেন তিনসঙ্গীর গল্পগুলোতে। ছোটগল্পের বিষয়কে খুঁজে নেবার প্রয়োজন হয় না, বিষয়ই অত্যুৎসাহী হয়ে ছোটগল্পের অঙ্গনে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলোই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এককথায় ছোটগল্পের নিপুণ স্রষ্টা, উপযুক্ত ধারক ও বাহক হলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের পরেই আসে কল্লোলের কাল। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই রবীন্দ্র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬), ও 'প্রগতি' (১৯২৭) নামে পত্রিকাগুলি।

নগরপ্রাণ কিছু স্পর্শকাতর তরুণদের রচনার দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে শুরু করল পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে অতি সাধারণ, অন্তেবাসীদের নিকট চলে এসেছিলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) নিম্নবিত্ত অসহায়দের বেদনার্তিকে গভীর মনন দিয়ে উপলব্ধি করে লেখেন — 'পুন্নাম', 'শুধু কেরাণী', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' প্রভৃতি গল্প। শৈলজানন্দ নেমে এলেন কয়লাকুঠিতে, বস্তিতে, ফুটপাতে। তিনি লেখেন 'কয়লাকুঠি' নামে বিখ্যাত গল্প। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) 'কাঠ খড় কেরোসিন', 'দুইবার রাজা', 'ধন্বন্তরি' ও বুদ্ধদেব বসু 'এমিলিয়ার প্রেম' প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে যৌনতা, অবক্ষয়, হতাশা, দুর্গন্ধময় স্খলন-পতনকে

অবলীলাক্রমে সাহিত্যে তুলে ধরেন।

'নিশিপত্র', 'মর্মকামনা', বনমানুষের হাড়' প্রভৃতি গল্পসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৩৮)। নারীদের অসহায় স্খলন-পতন ও পূতিগন্ধময় জীবনের কথা মরমী তুলিতে তুলে ধরেন তিনি। কল্লোলের লেখক হলেও স্বাতন্ত্র্যে ও গভীরতায় অনন্য হয়ে দেখা দেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। 'পয়োমুখম' এর মতো গল্পে তিনি সমাজের নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চক, স্বার্থপর মানুষকে দেখিয়েছেন।

এবার ছোটগল্পের আসরে এলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা কেউ প্রত্যক্ষভাবে কল্লোলের লেখক নন, তথাপি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বৈজ্ঞানিকদের মতো তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে জীবন জগৎ ও মানুষকে দেখেছেন। তাঁর রচনায় আবেগের আতিশয্য ও বিদ্রোহের মুখোশে যৌবন শক্তির অপচয় নেই। তিনি জীবনের রুক্ষ, কঠোর, সংস্কারাচ্ছন্ন বাস্তববোধকে জীবনের বৈচিত্র্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, আর এখানেই তাঁর বাস্তবতা ও স্বাতন্ত্র্য। 'প্রাগৈতিহাসিক', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারানের নাতজামাই' প্রভৃতির মতো গল্প বাংলা সাহিত্যকে তিনি উপহার দিয়ে ছোটগল্পের গতিতে দৃঢ়তা এনে দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) আমাদের 'মেঘ মল্লার' 'মৌরীফুল', 'যাত্রীদল', 'পুঁইমাচা'র মতো গল্প উপহার দিয়েছেন। কল্লোলের কালের হলেও বিভূতিভূষণ এই ধারার মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন না। প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণের প্রিয় বিষয় ছিল মাটির পৃথিবী ও নক্ষত্রখচিত আকাশের সৌন্দর্য।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭২) সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে। ছোটগল্পের বিষয় এবং স্বভাবকে তিনি অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের প্রেম, ভালোলাগা, আদিমবৃত্তি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করেছেন। 'নারী ও নাগিনী', 'তারিণী মাঝি', 'অগ্রদানী', 'জলসাঘর', 'কালাপাহাড়', 'রসকলি' প্রভৃতি গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে এবং রচনার ব্যঞ্জনা ও প্রকরণ ছোটগল্পের ভিত্তিকে সুদৃঢ়তা প্রদান করে।

যুবনাশ্ব, বনফুল, অন্নদাশংকর রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুখ গল্পকাররা কল্লোলের শেষ পর্যায়ে ছোটগল্পকে আরো বেশি দীপ্তি প্রদান করে গেছেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং শেষ হয় ১৯৪৫ এর সেপ্টেম্বরে। যুদ্ধ শুরুর আগে ও পরে যেসব সাহিত্যিকরা দেখা দেন তাঁরা হলেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫),

নবেন্দু ঘোষ (১৯১৭), বিমল কর (১৯২১), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) এবং মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬) প্রমুখ।

"কাব্যেণ হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে। এই উক্তির অনুকরণ করে বলা যায় যে আধুনিক কথয়া (অর্থাৎ উপন্যাসেন) হন্যতে কাব্যং (অর্থাৎ মহাকাব্য) কথা গল্পেন (অর্থাৎ ক্ষুদ্র গল্পেন) হন্যতে। উপন্যাসের আবির্ভাবে মহাকাব্যের তিরোধান ঘটেছে আর ছোটগল্পের আবির্ভাবে উপন্যাসের তিরোধান ঘটতে শুরু করেছে।" (বনফুল — ডঃ সুকুমার সেন) — এই উক্তির নিরিখে অনায়াসেই বলা যায় বর্তমান সাহিত্য জগতকে ছোটগল্পই বেশি সংখ্যায় সমৃদ্ধ করে চলেছে। অথচ সাহিত্যে এটিই কনিষ্ঠতম শাখা কিন্তু সবচেয়ে সমৃদ্ধ।

সাহিত্যের এই শাখাটির আঙ্গিক প্রকরণ এবং বিষয়-বৈচিত্র্য পাঠকদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। তেমনি আমাদের প্রিয় লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীকেও ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আশাপূর্ণা দেবীর স্বমুখ নিঃসৃত উক্তিটিই এর প্রমাণ দেয় — "ছোটগল্পই আমার প্রথম প্রেম"। উপন্যাস আশাপূর্ণা দেবীকে পাঠক সমাজে জনপ্রিয় করে তুললেও ছোটগল্পের মধ্যেই নিজের ছোট ছোট অভিজ্ঞতাকে প্রস্ফুটিত করে আনন্দ পেতেন। তাই ছোটগল্পই তাঁর প্রিয় হাতিয়ার।

আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট অসাম্য রয়েছে। এখন তা অনেকটা কমে এলেও আশাপূর্ণা দেবীর সময়ে এই বৈষম্য ছিল ভয়ানক। আর এই বোধটাকে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনাকে নারী-পুরুষের এই ভেদাভেদই ব্যথিত, আলোড়িত করে তুলত। এ থেকেই তাঁর মনে জন্ম নেয় এক প্রতিবাদী সত্তা। যার মূর্ত প্রকাশ ঘটে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের 'সত্যবতী' চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

জীবন ও সমাজের নানা বিচিত্রধর্মী বিষয় আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে স্থান পেলেও মূলতঃ সমাজে নারীদের অবস্থান এবং তাদের অন্তরসত্তাকে নিয়ে নানা কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনার বেশিরভাগ অংশই প্রতিবাদের আলোয় ঝলসে উঠেছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ঐ শতকেরই শেষ দশক পর্যন্ত লেখা গল্পগুলোর মধ্যে লেখিকার সমাজ ও জীবন সম্পর্কে যেমন গভীর জীবন দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে তেমনি সেই জীবনের চিত্রাঙ্কনের সার্থক শিল্পরূপও তিনি দান করে গেছেন।

জীবনের একদিকে রক্ষণশীলতা ও অপরদিকে প্রগতিশীলতা — এই দ্বন্দ্বময় ভাবনার মধ্যে দাঁড়িয়েই তিনি বহুবর্ণরঞ্জিত বৈচিত্র্যময়তাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবার নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রেম মনস্তত্ত্বকেও বিষয় হিসেবে প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত ধ্যানধারণাকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনের নানা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধগুলো কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তা দেখবার মতো এক মননশীল সস্নেহ উপস্থিতি আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে দেখা যায়।

আশাপূর্ণা দেবী ঔপন্যাসিক হিসেবেই অধিক পরিচিত এবং তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে নানাবিধ

আলোচনাও হয়েছে সাহিত্য মহলে। তেমনি গবেষণার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে উপন্যাসই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তদনুযায়ী ছোটগল্পকার আশাপূর্ণা সম্পর্কে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা গবেষণা ততটা দেখা যায় না। অথচ তাঁর বিষয় -বৈচিত্র্য, রচনার বাস্তবতা, প্রকরণ পাঠককুলকে যথেষ্ট আলোড়িত করে থাকে। তাই ছোটগল্পের আঙ্গিকে আশাপূর্ণা দেবীর জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ও গল্পের রূপায়ণে শিল্প রূপের যে সার্থকতা তাই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রকাশ করতে চেয়েছি।

গবেষণা পত্রে আলোচিত গল্পগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক গল্পের সময়ক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি। প্রায় দেড় সহস্রাধিক গল্পের মধ্যে যতটা অধিক সম্ভব সংগ্রহ করার পরেও কিছু কিছু গল্পের কালসীমা সঠিকভাবে নিরূপণ করে ওঠা সাধ্যের বাইরে থেকে গিয়েছে। গ্রন্থাগার থেকে লব্ধ কিছু পুস্তকাদির প্রাচীনত্বের কারণে প্রকাশকের ঠিকানা ও প্রকাশকাল দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

আশাপূর্ণা দেবী ছোটগল্পের মাধ্যমে জীবনের নানা দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপায়িত করতে গিয়ে নানাবিধ শিল্পরূপেরও আশ্রয় নিয়েছেন। তাই এই সমস্ত দিকগুলো সুপরিস্ফুটভাবে তুলে ধরার জন্য গবেষণা গ্রন্থটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। যেমন —

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন। বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিতা একজন লেখিকা যিনি সামান্যা নারী থেকে একজন দেশ-কালোত্তীর্ণা সাহিত্যিকে রূপান্তরিত হয়েছেন, স্বভাবতই তাঁর ব্যক্তি জীবন যথেষ্ট আকর্ষণীয় হবে। ব্যক্তি ছাড়া লেখিকা হওয়া কখনোই সম্ভব নয় বলেই এই অধ্যায়ে আমি আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবনকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে গল্প রচনার জীবনে প্রবেশের রূপরেখা। কিভাবে সাহিত্য প্রীতি ও সাহিত্য রচনা থেকে ছোটগল্প রচনার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে এখানে।

তৃতীয় অধ্যায়ে নানা অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনদৃষ্টিগত ভাবনাকে কিভাবে রূপায়িত করেছেন তা আলোচিত হয়েছে। নানা ভাবনাগত দিক থেকে গল্পগুলোর কিছু শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। লেখিকার নিজের চোখে দেখা জগৎ, অন্দর মহলের জগৎ এবং চার দেওয়ালের মধ্যে বসবাসকারী যে নারীরা তাদের তিনি কিভাবে তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন — সেই বিষয়টাকেই এই অধ্যায়ে আমি সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আশাপূর্ণা দেবীর দীর্ঘদিনের গল্প রচনা এবং ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে শিল্প রূপের দিকটি কিভাবে তুলে ধরেছেন তা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করার প্রয়াস রইল।

সমকালীন লেখকদের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর বিষয় এবং রচনাশৈলীর মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

উপসংহারে আলোচিত অধ্যায়গুলোর নিরিখে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়নের একটা চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়গুলোর ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে গবেষণাগ্রন্থটি রচনা করার প্রয়াস রইল।